অদ্বৈত মল্লবর্মণেরর প্রবন্ধ: আলোচনা পর্যালোচনা

ড.অরূপা চক্রবর্তী, অতিথি শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের জন্যই বাংলা সাহিত্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণের খ্যাতি ও পরিচিতি। কিন্তু গল্প, উপন্যাস, কবিতা, অনুবাদমূলক রচনা ইত্যাদি সকল বিষয়েই তিনি তাঁর শিল্পীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট। প্রাবন্ধিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের যুক্তিনিষ্ঠা তাকে আরো বড় শিল্পীতে পরিণত করেছে। বহু বিচিত্র বিষয় তাঁর প্রবন্ধের উপাদান হয়ে উঠেছে।

জীবনী বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে অন্যতম 'টি এস এলিয়ট' প্রবন্ধে এলিয়টের কবিতার মূল্যায়ণ ও তাঁর নোবেল প্রাপ্তির বিষয়টিকে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে এলিয়টের ন্যায় শক্তিধর কবি যুগের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছেন। কারণ রোমান্টিক যুগ পেরিয়ে সমসাময়িক বাস্তব পরিস্থিতিতে টি এস এলিয়ট তাঁর কাব্যসাহিত্যে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। কারণ তাঁর মতে "এলিয়টের কবিতার মূলে আছে সমষ্ঠির দুঃখ বেদনা অভাব নৈরাশ্যকে বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে দেখার এবং এমনকি নির্মম হয়েও তার অন্তরের হাহাকারকে ভাষা দেবার ক্ষমতা।"[১] প্রাবন্ধিকের মতে এলিয়টের নিজস্বতার জন্যই তাঁকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট কাব্যের জগৎ গড়ে উঠেছে। এলিয়ট তাঁর কাব্যের মাধ্যমে সমসাময়িক মানুষের চিন্তা চেতনা ও মননে এক নতুনত্বের আশ্বাস দিয়েছেন। এলিয়টের জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে। তাঁর মতে এলিয়টের 'wast land' সভ্য মানুষের খাঁটি রূপ নির্মমভাবে উদঘাটিত করেছেন। এলিয়টের এই ভাবনা পরবর্তী কবিজগতকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। 'wast land' বইটি মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের গতিপ্রকৃতি নিয়ে লেখা। এই কাব্যের সুদূরপ্রসারী মনোভাব তৎকালীন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সমাজকে প্রভাবিত করেছে। প্রাবন্ধিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের মতে- "তাঁর রচনা ও জীবন দর্শন ভাষার দিক বিবেচনায় ইংরেজী ও আমেরিকান সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে বিশ্ব-সাহিত্যকে।"[২]

'রোকেয়া জীবনী' প্রবন্ধে নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতির মহান কর্মে নিয়োজিত থাকা বেগম রোকেয়ার সংগ্রামমুখর জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। নারী শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া বিশিষ্ট অবদানকে তুলে ধরেছেন। নিজে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের মানুষ হওয়ার দরুন অবরোধবাসিনী শিক্ষার আলোক বঞ্চিত মুসলমান নারীদের বন্দী জীবনের কথা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। যা তাঁর সাহিত্য ও জীবনদর্শনের মাধ্যমে সকলের কাছে তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র কুসংস্কারকে তুলে ধরা নয়, নিজের জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি নারীদের মঙ্গলময় জীবনের উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করেছিলেন। নিজের জীবনের সর্বস্ব দিয়ে তৈরি করেছেন শাখাওয়াত মেমোরিয়াল বিদ্যালয়। নারী শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের জন্য বঙ্গীয় মুসলিম ও হিন্দু উভয় নারী সমাজ বেগম রোকেয়ার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

নাটক বিষয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের এক পরিপূর্ণ চিন্তার প্রকাশ রয়েছে 'নাটকীয় কাহিনী' প্রবন্ধে। এখানে মূলত নাট্যশিল্প ও তার উপস্থাপনের বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর মতে; "নাটকের গোড়াপত্তন কিন্তু নাট্যশালায় নয় বাইরে- উতসাহী লেখকের লেখবার টেবিলে। লেখক যখন বুঝবে যে এইবার সম্পূর্ণ হয়েছে,- নাটকের তখনই রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ।"[৩] তাছাড়া নাটকের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, প্রযোজনা, মহড়া, ড্রেস-রিহার্সেল, নাটকে নাট্যকারের স্থান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ব্যাক্তিগত মতামত স্থান পেয়েছে। নাটক লেখার পর থেকে ক্রমে নাটকের অভিনয় সফলতা পর্যন্ত একজন নাট্যকারের বিভিন্ন চিন্তার বিশ্লেষণ করেছেন প্রাবন্ধিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। শিশু মনস্তত্ত্বের চমৎকার বিশ্লেষণ রয়েছে তাঁর 'ছোটদের ছবি আঁকা' প্রবন্ধে। শিশুদের মধ্যে জন্মের পর থেকেই আঁকার এক স্বাভাবিক সহজাত প্রবণতা থাকে। সে আপন মনের খেয়াল খুশিতে ছবি আঁকে। এর মধ্যে প্রচার বা প্রশংসার কোনো তাগিদ থাকে না। তাই শিশুকে ছবি আঁকা শেখাতে গেলে মূলত শিশুর মতো মন নিয়ে বুদ্ধির পরিপক্কতা ত্যাগ করে তবেই শিশুকে আঁকা শেখাতে হবে। আর এ কাজ করতে পারবেন একজন প্রকৃত শিল্পী। কারণ শিল্পীর মনের অন্দরে সবসময়ই মানসিকতা বিরাজমান। শিশুকে আঁকা শেখাতে গেলে সেই শিশুসুলভ মানসিকতা নিয়েই শেখাতে হবে। শিল্পকলা বিষয়ক আরেকটি প্রবন্ধ 'প্রাচীন চীনা চিত্র-কলার রূপ ও রীতি'তে চীনের চিত্রকলার উদ্ভব ও প্রসার ও প্রাচীনত্ব বিষয়ে আচলোচনা স্থান পেয়েছে।

প্রবন্ধিকের মতে শিল্প প্রকাশের তিন ধারা। কথাশিল্প, সুরশিল্প ও চিত্রণশিল্প। এই তিন শিল্প সৃষ্টির মধ্যে রূপে, রঙে যাঁদের শিল্প প্রকাশিত তারাই তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ শিল্পী। কারণ শিশুমন প্রথমেই সুর ও কথাশিল্প সম্পর্কে প্রস্তুত থাকে না। তাই তাকে বিশ্ব প্রকৃতির শিক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই চিত্রণ শেখানো প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। শিশুদের নিচু ক্লাস থেকেই চিত্রণ শিক্ষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন। শিশুকে শিল্পশিক্ষা দেওয়ার জন্যও শিক্ষককে পথপ্রদর্শক হয়ে কাজ করতে হবে। এখানে প্রমথ চৌধুরীর 'বইপড়া' প্রবন্ধে রয়েছে 'শিক্ষকের কাজ শুধু শিক্ষাদান করা নয়, ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়।' প্রাবন্ধিক অদ্বৈতের মুখে আমরা শুনতে পাই- "শিশু প্রকৃতির মাধুরীতে নিজের মাধুরী মিশিয়ে আপনা থেকে শিক্ষিত হয়ে উঠবে- শিক্ষক থাকবে শুধু তাকে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য- তাকে নানা ইঙ্গিত দেখিয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে নেবার জন্য।"[৪] শিশুর অঙ্কন শিক্ষাও এইরকমই হবে। শিক্ষককে শিশু মনে অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করে এগিয়ে যেতে হবে। শিশুকে বিশেষজ্ঞ আর্টিস্ট নয়, শিশুর মনকে প্রকৃতভাবে গড়ে তুলতে গেলে তাঁর আঁকা শেখার প্রয়োজন। এর দ্বারাই শিশুর মনন, চিন্তা ও রুচিবোধ উন্নত হয়ে সে প্রকৃত মানুষ তৈরি হবে।

'আম্রতত্ত্ব' প্রবন্ধে প্রথম অংশে পরিহাসপ্রিয় অন্য এক অদ্বৈত মল্লবর্মণকে পাই। এখানে আমের সম্পর্কে হিন্দু ও বঙ্গীয় মুসলমান মুসলিম সমাজে প্রচলিত লোককথাকে অত্যন্ত পরিহাসপ্রিয় করে পরিবেশন করেছেন। এদেশে আমের জন্ম নিয়ে নানা প্রচলিত মিথ ও হেঁয়ালির উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষকদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের বিষয়টিকে তুলে

ধরেছেন। এখানে একদিকে কৃষিবিদ্যায় তাঁর আগ্রহ ও আমাদের বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকসমাজের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। আম চাষ করে কিভাবে উপার্জন করতে পারবে এর বিভিন্ন দিকগুলি তাঁর প্রবন্ধে উঠে এসেছে। কৃষকদের পাশাপাশি গৃহস্থ বাড়িতেও আম চাষ করে লাভবান হতে পারবে। 'আম্রতত্ত্ব' প্রবন্ধটিতে অদ্বৈত মল্লবর্মণের কৃষকদরদী মনের পরিচয় পাই।

'এদেশে ভিখারী সম্প্রদায়' প্রবন্ধে প্রথমেই তিনি আমাদের বাংলাদেশের অতিথি ও ভিখারির মধ্যেকার পারস্পরিক অভেদত্বকে তুলে ধরেছেন। এরপর বাংলাদেশের চৈতন্য আগমনের পরবর্তীতে সৃষ্ট বৈষ্ণব সমাজের ভিক্ষাবৃত্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। হিন্দু ধর্মের মতো মুসলমান সমাজের ফকিরদের ভিক্ষাবৃত্তির কথাও তাঁর প্রবন্ধে উঠে এসেছে। আদর্শ বৈষ্ণবের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে তাঁর একজন পরিচিত বৈষ্ণব মহাপ্রভুর ভেক্ গ্রহণের পর ভিক্ষালব্ধ অন্ন রোজ রাধামাধবের কাছে ভোগ লাগাত। কিন্তু একদিন ভিক্ষা করতে গিয়ে সে অপমানিত হওয়ার পর সে তার আশ্রমেই কৃষি কাজ করে রাধামাধবের পূজা করতে শুরু করেন। অন্য বৈষ্ণবদের এতে আপত্তি হয়েছিল, কিন্তু প্রাবন্ধিকের কাছে বিষয়টি প্রশংসনীয় হয়েছে। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রাবন্ধিক একেবারেই সমর্থন করেননি। এর বদলে ভিক্ষুকদের কিছু সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কিছু কাজ করে ভিক্ষা গ্রহণের কথা বলেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি পাঠকদের এক বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তা হল তার এই মানসিকতাকে ভিক্ষুকদের মধ্যে প্রচার করে দেওয়া। কারণ ভিক্ষুকরা এ লেখা পড়তে পারবে না। এখানেও প্রাবন্ধিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের মানবদরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

'ভারতের চিঠি- পার্লবাক্‌কে' প্রবন্ধে তিনি আমাদের সমকালীন দেশের সমকালীন সামগ্রিক পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের বিবরণ তুলে ধরেছেন। মার্কিন লেখিকা পার্ল এস বার্ক ১৯৩১ এ তাঁর গুড আর্থ উপন্যাসটি লিখেছিলেন, ১৯৩৮ সালে এর জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান। চীনের অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ কবলিত এক চীনা কৃষক পরিবারের কাহিনি এতে বিবৃত। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এ উপন্যাসটি যখন পড়েন তখন তিনি বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত ভারতের কথা জানাতে গিয়ে তিনি বলছেন, যদি আসতে একবার আমাদের দেশে তবে দেখতে পেতে, বই লেখার কি চমৎকার উপাদান-রাশি রাশি জমাট বাঁধা মালমশলা আমাদের এখানে পড়ে আছে। অদ্বৈত বলছেন, যে ভারতকে নিয়ে লিখলে পার্ল বার্ক হয়তো নোবেল পেতেন না। ভারতে 'গুড বার্থ' এর দ্বিতীয় খণ্ড লেখার প্রচুর উপাদান রয়েছে, কিন্তু এটা লিখলে পার্ল বার্ককে নোবেল প্রাইজের অর্থ প্রত্যার্পণের দাবী উঠতে পারে বলে তিনি মনে করেন। এর মধ্যে প্রাবন্ধিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের বেশিরভাগ প্রবন্ধ লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। এর মধ্যে রয়েছে 'ত্রিপুরার বারমাসী গান' প্রবন্ধে ত্রিপুরার পল্লীর স্ত্রীলোকদের অন্তরের গভীর বেদনার চিত্র। প্রবাসী স্বামীর বিরহী নারীর বারোমাসের দুঃখের কাহিনি এই সমস্ত গানে পরিস্ফুট হয়। প্রজন্ম পরম্পরায় নারীরা বয়স্ক নারীদের কাছ থেকে এগুলি শিখে নেয়। পাচ-সাত জন নারী একত্রিত হয়ে কাজের ফাঁকে বারোমাসী গান গায়। লেখকের মতে "কি কবিত্ব হিসাবে, কি ভাবে, কি ভাষায়, কি শব্দমাধুর্যে সবগুলি বারমাসীই খুব সুন্দ্র। পল্লীর প্রাণের যথার্থ আবেগ ও বেদনা যেন গানগুলিতে মূর্ত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে।"[৫] 'দুইটি বারমাসী গান' প্রবন্ধে তাঁর সংগ্রহ করা একটি রাধার বারমাসী ও সীতার বারমাসী গানের বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে।

'পল্লীসঙ্গীতে পালা গান' প্রবন্ধে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ভাটিয়াল, মহাজনী, বারমাসী, জলভরণী প্রভৃতি পালার উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া বিনোদের পালা ও কুটুমিঞার পালা বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। 'শেওলার পালা'য় কালাচাঁদ নামক যুবককে ভালবেসে শেওলাবালার হতাশ প্রেমের বুকভরা করুণ ট্র্যাজেডি বর্ণিত হয়েছে। 'বরজের গান' প্রবন্ধে ত্রিপুরা জেলার উত্তরাংশে পল্লীবাসী নারীদের মধ্যে প্রচলিত বরজ ব্রতের রীতি-নীতি ও ব্যবহৃত গানের উল্লেখ করেছেন। 'জলসওয়া গীত' প্রবন্ধে পল্লীগ্রামে বিবাহের সময় জল সওয়ার সময় যে গান ব্যবহৃত হয় তার উল্লেখ রয়েছে। বিবাহের পর নব বধূকে পিতৃগৃহে আনার নাম 'নাইওর' দেওয়া বলে। সেই নাইওর যাওয়ার জন্য গ্রাম্য বধূর উৎকণ্ঠার বর্ণনা রয়েছে 'নাইওরের গান' নামক প্রবন্ধে।

প্রেমিককে পাখীর সঙ্গে তুলনা করে পল্লী কবিদের রচিত গানের উল্লেখ রয়েছে 'পাখীর গান'প্রবন্ধে। 'উপাখ্যানমূলক সঙ্গীত' প্রবন্ধে উদ্ধবের গান ও বানিয়ার গানের আলোচনা স্থান পেয়েছে। বাংলার ঘরে ঘরে বোন ভাইকে ফোঁটা দিয়ে তার সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে। সেই ভাই ফোঁটাকে নিয়ে গ্রামীণ কবিদের রচিত সঙ্গীতের বর্ণনা রয়েছে ভাই-ফোঁটার গান প্রবন্ধে। 'পরিহাস সঙ্গীত' এ নাতনীর গান ও ঝিয়ারির গানের উল্লেখ রয়েছে। পূর্ববঙ্গের অবিবাহিত হিন্দু বালিকারা মাঘ মাসে যে সূর্য-ব্রত করে তাকেই মাঘমণ্ডল ব্রত বলা হয়। 'মাঘ-মণ্ডল' প্রবন্ধে সেই ব্রতের অনুষ্ঠান ও রীতির কথা প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে "মেয়েরা প্রচুর আনন্দ, নিষ্ঠা এবং ভক্তির সহিত এই পূজা করিয়া থাকে। পূজার সময় মেয়েরা কতকগুলি ছড়া বা মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া থাকে। পল্লীর অন্যান্য ছড়ার ন্যায় এইগুলিও উপভোগ্য।" তাছাড়া 'অপ্রকাশিত পুতুল বিয়ের ছড়া', 'অপকাশিত বাউল সঙ্গীত' প্রবন্ধগুলিতেও প্রাবন্ধিক তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সংযত ভাষার প্রয়োগ, স্বচ্ছচিন্তা, যুক্তিনিষ্ঠা, মনন, বুদ্ধিদীপ্ততা অদ্বৈত মল্লবর্মণের বিবিধ প্রবন্ধে ধরা পড়েছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন, যার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে তাঁর বিচিত্র বিষয়ের প্রবন্ধে। ভাবনার স্বচ্ছতা, পরিহাস প্রবণতা ও বাক্‌ভঙ্গিমা তাঁর প্রবন্ধগুলিকে পরিশীলিত ও সরস করেছে।

<u>উল্লেখপঞ্জি</u>

১। মল্লবর্মণ অদ্বৈত- রচনাসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা-৬০
২। ঐ বই, পৃষ্ঠা-৬৩
৩। ঐ বই, পৃষ্ঠা- ৪২
৪। ঐ বই, পৃষ্ঠা-১২০

৫। ঐ বই, পৃষ্ঠা-১০৩